দারিদ্র

কেড়ে নিচ্ছে শিশুদের শিক্ষার অধিকার

কাওসার রহমান

দরিদ্রতাই কেড়ে নিচ্ছে চরাঞ্চলগুলোর শিশুদের শিক্ষার অধিকার। যে বয়সে একটি শিশুর স্কুলে যাওয়ার কথা, মনশীলতা বিকাশের জন্য খেলার মাঠে ছুটে বেড়ানোর কথা, সেই বয়সে দেশের চরাঞ্চলের শিশুরা নানান ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হয়ে পড়ছে। দরিদ্রতাই যে এই শিশু শ্রমের অন্যতম কারণ তা চরাঞ্চলগুলোর সরেজমিন পরিদর্শন থেকে বেরিয়ে এসেছে। তাই শুধু দারিদ্র্য দূরীকরণই নয়, সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন করতে হলেও পিছিয়েপড়া চরাঞ্চলগুলোতে শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ।

পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার ৬৬টি চরে বসবাস করছে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ। তারই একটি চরতলা। এ চরের ভূমিহীন আব্দুল গাজীর মেয়ে–নাজমা আর মহিমা। নাজমার বয়স বারো, মহিমার দশ। হতদরিদ্র আব্দুল গাজীর এ মেয়ে দুটি 'কামাইর পুত'। ওরা আছে বলেই তার সংসারের চাকা একেবারে থেমে যায়নি। বাড়ির ধার দিয়ে বয়ে চলা দাড়চিরা নদীতে সকাল-সন্ধ্যা বাগদা চিংড়ির পোনা ধরে। বর্ষায় ঝিয়ের কাজ করে জোতদার বাড়িতে। আবার ধানের মৌসুমে 'ছড়া টোকাইন্যা' হয়ে চলে যায় দূরবর্তী চরে। স্কুলে যাবার ফুরসত নেই। আব্দুল গাজী বলেন, 'মাইয়া দুইডা না থাকলে আমগো না খাইয়া থাকতে হইতো। নাইলে খয়রাত করতে নামতে হইতো। ল্যাহাপড়া শিকার সুমায় কৈ?'

মহিমা আর নাজমার মতো পটুয়াখালীর গলাচিপা উপজেলার সমুদ্র উপকূলের ১১ হাজার শিশু স্কুলবিমুখ। সূর্য ওঠার আগেই টানাজাল নিয়ে ওদের নামতে হয় দাড়চিরা, আগুনমুখা, কাজল কিংবা বঙ্গোপসাগরের স্রোতে। এই শিশুদের সবাই মৌসুমী পেশাজীবী। ইচ্ছা থাকলেও ওদের পক্ষে সম্ভব হয় না স্কুলে যাওয়া। ভূমিহীন বাবার সংসারে নিত্যকার টানাপড়েনের মধ্যে হারিয়ে গেছে ফুলের মতো শিশুদের স্বপ্ন-সাধ। চৈত্রের শুরু থেকে বৈশাখের শেষ পর্যন্ত ওদেরকে ব্যস্ত থাকতে হবে বাগদা চিংড়ির পোনা ধরার কাজে। আবার শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ কার্তিক মাস থেকে শুরু হয় ধান কুড়ানোর কাজ। স্থানীয় ভাষায় ওদেরকে বলে 'ছড়া টোকাইন্যা।' ফাল্গুন-চৈত্র থেকে আরম্ভ হয় চিংড়ি পোনা সংগ্রহ। জ্যৈষ্ঠ থেকে বর্ষার ভর মৌসুম পর্যন্ত বড়দের সঙ্গে ওরা মাছ ধরে নদীতে। এই শিশুদের একটি অংশ সারাবছর গরু চরায় স্থানীয় জোতদার-মহাজনদের।

গলাচিপা শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে জানা গেল, উপজেলার ৬৬টি চরের প্রায় ৪০টিতেই সরকারী-বেসরকারী কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসের তথ্যানুযায়ী, গলাচিপার ২৫টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। চরের ৭টি ইউনিয়নে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪০টি। রেজিস্টার্ড স্কুলের সংখ্যা ২৭টি। আর কমিউনিটি স্কুল রয়েছে ৭টি। যেখানে ক্লাস ওয়ান থেকে টু পর্যন্ত পড়ালেখার সুযোগ রয়েছে। ৪০ শতাংশ উপবৃত্তি পাবার কথা থাকলেও গলাচিপা উপজেলায় এর পরিমাণ ২৬ শতাংশ। সমুদ্র উপকূলের চরগুলোতে এই বৃত্তির পরিমাণ আশঙ্কাজনক হারে কম।

চরের সাতটি ইউনিয়নের লোকসংখ্যা প্রায় দু'লাখ। ইউনিয়নগুলোতে গ্রাম রয়েছে ৮৩টি। এসব গ্রামে স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা ৪০ হাজারের মতো। এদের মধ্যে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা সাড়ে ২৪ হাজার। ওদের ৪ শতাংশও স্কুলে যায় না বলে জানালেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা।

বেসরকারী সংস্থার তথ্য থেকে জানা যায়, স্কুলবিমুখ শিশুর সংখ্যা ১০ হাজারের অধিক। সরেজমিনে চরকপালবেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, শিশু শ্রেণী থেকে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩২৭। কিন্তু গড় উপস্থিতির হার ২শ' জনেরও কম। ভর্তি হওয়া অন্য শিক্ষার্থীরা কেন স্কুলে আসে না তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হালিম বলেন, বছরের এই সময়ে চরের ছেলে-মেয়েরা নদী ও সাগরে চিংড়ি পোনা ধরতে যায়। যে কারণে উপকূলের সব স্কুলেই এই সময়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি আশঙ্কাজনক হারে কম থাকে। আবার শীতের সময়ও তারা ধান কুড়াতে যায় মাঠে-মাঠে। প্রতিকূল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বর্ষায় স্কুলে আসতে পারে না শিশুরা। যে কারণে বছরজুড়ে কোন না কোন সমস্যা এই শিশুদের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করছে।

অভাব, দারিদ্র্য আর প্রাকৃতিক দুর্যোগের চক্র মোকাবেলা করার মতো অবস্থা নেই চরের শিশুদের। এসব কারণেই ভূমিহীন কৃষক-মজুরের ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলে আসা সম্ভব হয় না।

চরকপালবেড়া স্কুল মাঠে দুপুরের কড়া রোদ উপেক্ষা করে গোল্লাছুট খেলছিল রেশমা বেগম। বর্গা চাষী জব্বার শিকদার ওর বাবা। নয় বছরের রেশমা এবার ক্লাস টু'তে উঠেছে। ১৮ দিন অনুপস্থিতির পর স্কুলে এসেছে মেয়েটি। ওর বন্ধুরা জানায়, প্রায়ই স্কুল কামাই দেয় রেশমা। এ প্রসঙ্গে রেশমা জানায়, 'কয় দিন ধইর‍্যা নদীতে পোনা পড়ে না। তারপরও পোনা গ্রামে হেইয়ো আশায় সাগরের পারে-পারে ঘুরচি। ইস্কুলে আউন্যা সুমায় পাই নাই। ইস্কুলে আইলে মোগো প্যাট ভরবে না।'

অনেক চাওয়ার পরও স্কুল গড়ে ওঠেনি চরবাংলায়। সেখানকার ভূমিহীন কৃষক-দিনমজুর বিষয়টি স্থানীয় চেয়ারম্যানের কাছে বললেও কোন কাজ হয়নি। মজিদ ফকিরের অভিমত, 'মোগো চরেতো কোনো ইস্কুলই নাই। ল্যাহাপড়া শিকাবো কোতায়?' এসবের উল্টো অবশ্য চররুস্তমের বেলাল মোল্লা (৪৫)। তিনি বললেন, 'এ্যাকটা পোনা ধরলে পায় আইআনা। ড়েইলি পঞ্চাশডা ধরলে অইবে ২৫ ট্যাহা। মোগো কোনডা লাব অয় আপনারাই কন।'

চরের যে সরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ক্লাস হচ্ছে তার অবস্থাও শোচনীয়। ৩৫টি স্কুল চলছে স্থানীয় সাইক্লোন সেন্টারে। সত্তর সালে বন্যার পর এগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল উপকূলীয় মানুষের জন্য। দশ বছর আগে স্থানীয় প্রকৌশল অধিদফতর এগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ, পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছে। তারই এক তলা, দোতলাতে চলছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ। যে কারণে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসার আগেই কিংবা একটুখানি বাতাস উঠলে ছুটি হয়ে যায় এসব স্কুলের। জাকারিয়ার বয়স ১০ আর সাথীর ১২। পূর্বচরলতার এই দু'জনই মৌসুমী শিশু। প্রতিদিনের মতোই ওরা টানাজাল নামিয়েছিল সাগরে। বাগদা চিংড়ির পোনা ধরতে না পেরে সেখান থেকে চলে এসেছে দাড়চিরা নদীর মোহনায়। কোমর পানিতে নেমে প্রবল স্রোত উতরে বাগদার বাচ্চা ধরছে দু'জন। ওদের মতোই উপকূলীয় এলাকায় হাজার হাজার শিশু রয়েছে। সাগর সংলগ্ন গলাচিপার ৭০টি চরে ধানের চাষ হয়। পড়ালেখা বাদ দিয়ে বতরের সময় এক চর থেকে দুর্গম চরে ধান কুড়াতে যায় এসব শিশু। এই ধান কুড়ানো শিশুদের বয়স ৭ থেকে ১৩। ক'দিন আগে ধান টোকানোর দলে ছিল চরআগুনমুখার কারিবুল। ধানের শীষ ছাড়াতে গিয়ে ওর কচি হাতের তালু থেঁতলে গেছে। রক্তাক্ত হয়ে গেছে ফর্সা পা দু'খানি। কাটাছেঁড়া শরীর নিয়ে পোনার আশায় তবু নেমেছে সাগরের নোনা পানিতে।

চররুস্তমের মোবারক জানিয়েছে, স্কুলে যাওয়ার চেয়ে ধান কুড়াতেই ওর ভাল লাগে। বড় হয়ে রেলগাড়ির ড্রাইভার হতে চায় চরকাজলের শিশু ওয়াছেল। মাথার বেণী দুলিয়ে এগিয়ে আসে এগারো বছরের মৌসুমী। গায়ে তেলচিটকানো ছেঁড়া ফ্রক। স্কুলে যায় মাঝেমধ্যে। বাবা জালাল হাওলাদার ভূমিহীন কৃষক। হাঁপানি শ্বাসকষ্টে সারাবছর অসুস্থ থাকেন। সংসার চালাতে তাই মৌসুমীকে মাছ ধরতে হয় সাগরে-নদীতে। কখনও ধানের শীষ কুড়াতে যেতে হয় দূর চরে। বাকি সময় ঝিয়ের কাজ করে পেট ঠিকায়। প্রতিবছর ঈদ আসে, আসে নবান্ন দিন। উৎসবের কোনটিই পালন করা হয় না মৌসুমী, কারিবুল, জাকারিয়া, নাজমা কিংবা মহিমাদের।

একই অবস্থা তিস্তা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলগুলোতে। তিস্তার হারাগাছ এলাকার একটি চরের নাম মায়াবাজার চর। এ চরে বাস করে প্রায় ১২শ' পরিবার। সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, এ সকল পরিবারের কর্তারা প্রতিদিন কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে জেগে প্রাত্যহিক কাজ সেরেই বেরিয়ে পড়েন এলাকার বিভিন্ন বিড়ি তৈরির কারখানায়। বাড়ির বউ-ঝিরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন গৃহস্থালি কাজে কিংবা অন্যের বাসায় কাজ করে দুটো পয়সা রোজগারের আশায়। আর পরিবারের শিশুরা কেউ বিড়ি ফ্যাক্টরি, কেউ রাখাল বালক কিংবা খেলাধুলায় বেরিয়ে পড়ে। এ চরের পরিবারগুলোতে রয়েছে প্রায় তিন হাজার শিশু। এদের কারও মধ্যেই জ্ঞানচর্চার বালাই নেই। দরিদ্রতা, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে তারা বেড়ে উঠছে। কেউ কেউ স্কুলে গেলেও প্রাইমারির গণ্ডি কেউ পেরুতে পারেনি। বরং এলাকার দারিদ্র্যর সুযোগ নিয়ে মাদক চোরাচালানিরা এ সকল শিশুকে মাদক পাচারে ব্যবহার করছে। এনজিওদের উদ্যোগে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হলেও, একজন শিক্ষক দিয়ে তা চালানো হচ্ছে। শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষা সরঞ্জাম না থাকার কারণে স্কুলে আগত শিশুরাও সঠিক শিক্ষা পাচ্ছে না। দারিদ্র্যের কারণে বরং পিতামাতারা তাদের সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে ছোটবেলা থেকেই কাজে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করে।

দারিদ্র্যের কারণেই দেশের গরিব পরিবারের শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। ফলে জীবন জীবিকার তাগিদে তারা নানা ধরনের কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী, দেশে মোট শিশুর সংখ্যা চার কোটি ২২ লাখ। এর মধ্যে স্কুলগামী শিশুর সংখ্যা তিন কোটি ৩৩ লাখ। অবশিষ্ট ৯১ লাখ শিশু স্কুলবঞ্চিত। এ দেশের মধ্যে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা ৩২ লাখ।

স্কুলবঞ্চিত শিশুরা শুধু শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে না, তারা স্বাস্থ্যসেবা, সুষম খাদ্য ও বিনোদন থেকেও বঞ্চিত। এই বঞ্চনা অগণিত শিশুর পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের পথে বাধা হিসাবে কাজ করছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে স্কুলে যাওয়া কিংবা খেলাধুলার বয়স থেকেই এ সকল শিশু শ্রমিকে পরিণত হয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। গত দুই দশক ধরেই শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের স্কুলে পাঠানোর কথা বলা হলেও, বাস্তবধর্মী পদক্ষেপের কারণে তাদের স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না। ফলে অপুষ্টি নিয়ে বেড়ে উঠছে এদেশের শিক্ষাবঞ্চিত অগণিত শিশু।

এ প্রসঙ্গে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মোসলেমা বারী বলেন, দারিদ্রের কারণে বহু পরিবারের সন্তান স্কুলে যেতে পারে না। তাদেরকে স্কুলে যাওয়ার বয়সেই কাজে জড়িয়ে পড়তে হয়। এই শ্রমিজীবী শিশুদের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রতি দশজন শিশুর মধ্যে চারজনই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। আর প্রতি দশজন শিশুর মধ্যে মাত্র চারজন ঠিকমতো লিখতে ও পড়তে পারে। পিআরএসপিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা না পাওয়াটাই দরিদ্রদের একটি উপাদান। দরিদ্রদের শিক্ষা না পাওয়ার সংখ্যা বেশি এবং এটাই দরিদ্রদের সামর্থ্যকে দুর্বল করে দেয়। দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভর্তির হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান কমে গেছে। এতে ২০০৭ সাল নাগাদ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল এবং উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির হার বাড়ানোর কথা বলা হলেও, শিক্ষার হার বাড়ানো এবং এজন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি।

শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য মোট জাতীয় আয়ের অন্তত সাড়ে পাঁচ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া উচিত। অথচ বাংলাদেশে ব্যয় হচ্ছে জিডিপির তিন শতাংশেরও কম। এই ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা পিআরএসপিতে অনুপস্থিত। বর্তমানে শিক্ষা বাজেটে যে বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তার ৯৮ দশমিক নয় শতাংশই ব্যয় হচ্ছে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা বাবদ। বিশ্বের মধ্যে শিক্ষা খাতে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে যে সকল দেশ তার অন্যতম হলো বাংলাদেশ। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য শিক্ষার ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই।